কসাই টিক্কা খান বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর!

অজয় দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্ব যার ওপর অর্পিত হয়েছিল, বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত সেই নিষ্ঠুর ঘাতক টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা আচার্য ছিলেন! ভূমিকম্পের যেমন এপিসেন্টার থাকে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ঢাকায় যে জেনোসাইড শুরু করেছিল, তারও এপিসেন্টার ছিল এবং সেটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক, সাজোয়া গাড়ি, মেসিনগান, মর্টার ও রাইফেল সজ্জিত হিংস্র বাহিনীর প্রধান তিনটি টার্গেট ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প এবং পিলখানার সীমান্তরক্ষী বাহিনী ইপিআর সদর দফতর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত আকস্মিক ছিল না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৫২ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা ভুন্ডুল করে দিয়েছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাই ছিল আইয়ুব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের সামনের সারিতে। আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি প্রদান করেন এবং জনগণ বিপুলভাবে এ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানাতে থাকে। আইয়ুব খান কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে এ আন্দোলন দমনের অপচেষ্টা চালান। তাঁর লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি প্রদান। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ বা ডাকসুর নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কারণে এ চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিঃশর্তে মুক্তিলাভ করেন এবং জনগণ তাকে 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে বরণ করে নেয়।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন (৩ মার্চ ঢাকায় নির্ধারিত)স্থগিত করায় বাংলাদেশের জনগণ বুঝে যায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না পাকিস্তানর সামরিক জান্তা। 'জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা' এ সব স্লোগান দিয়ে জনগণ রাজপথে নেমে আসে। ১ মার্চ সন্ধ্যায় ইকবাল হলের নাম পরিবর্তিত হয় নতুন নাম শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলের নাম দেওয়া হয় সূর্যসেন হল। স্বাধীনতার আন্দোলন যখন সশস্ত্র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এরাই যে হবেন নায়ক!

২ মার্চ বটতলায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চের পর রাগে-ক্ষোভে সেই বটগাছটি সমূহে উৎপাটন করে অজানা স্থানে ফেলে দেয়। এখন যে বটগাছটি আমরা দেখি মহীরুহ রূপে, সেটির চারা ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি রোপণ করেছিলেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বটতলায় নতুন একটি চারা রোপণের বিরল সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। এ বটগাছটি বেড়ে উঠছে স্বাধীনতার সমান বয়সী হিসেবে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সে সময়ের রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অপরাধ' যে অনেক। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছাত্র-জনতাকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়ে যায় সামরিক প্রশিক্ষণ, পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য সামরিক প্রস্তুতি। ছাত্রীরাও এতে অংশ নিতে শুরু করে। কয়েকদিনের মধ্যে গোটা বাংলাদেশে এ ধরনের সমর-প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ২৫ মার্চের পর এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা টর্চার ক্যাম্পে পরিণত করেছিল। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই ছিল হানাদারদের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার চিত্র।

২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়ন শুরু হয়। হানাদাররা গ্রহণ করে পোড়ামাটির নীতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের ডাক দেন। তাকে গ্রেফতার করে শত্রুরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র স্থানে চলে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। এর মধ্যেই বিশেষভাবে টার্গেট করা হয় জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ড. জিসি দেব, ওই সময়ের প্রভোস্ট ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং মধুর ক্যান্টিনের মালিক মধুসূদন দে'কে। সবার প্রিয় মধুদা তাঁর ক্যান্টিনে কেবল চা-সিঙ্গারা বিক্রি করতেন। ছাত্ররা তাঁর ক্যান্টিনে বসে বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা করতো, সমাবেশ করতো এতে তিনি বাঁধা দিতেন না। গোয়েন্দারা তাদের সহযোগী হতে

তাকে ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখায় কিন্তু তিনি তাতে সায় দেন না। এ কারণে পরিবারের সদস্যসহ তাকে নিষ্ঠুরভবে হত্যা করা হয় ২৬ মার্চ সকালে। জগন্নাথ হলের গণকবরে আরও অনেকের সঙ্গে তিনি সমাহিত হয়েছেন।

পাকিস্তানের হানাদারদের ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ওপর রোষ তো হবেই। টিক্কা খানকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' গভর্নর ও প্রধান সামরিক আইন প্রাশসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। তাকে অনেক আগে থেকেই অভিহিত করা হতো বেলুচিস্তানের কসাই হিসেবে। সেখানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের জন্য এই নরপিশাচ ভয়ঙ্কর সব কৌশল অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৮ মার্চ তাকে গভর্নর হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানান। পরে তিনি শপথ নেন ৯ এপ্রিল, ২৫ মার্চ বাংলাদেশকে বধ্যভূমিতে পরিণত করার জন্য নিষ্ঠুর অভিযান শুরুর দুই সপ্তাহ পর।

গভর্নর হিসেবে টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ধূলিকণা ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের রক্তে রঞ্জিত, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এ অপরাধের প্রধান হোতা!১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সনদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কার্জন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবল বিক্ষোভ আয়োজন করে ভুন্ডুল করে দেয়। কারণ তিনি বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। ছাত্র-শিক্ষকদের অকল্যাণের জন্য কাজ করছন। তিনি ধিকৃত একজন ব্যক্তি। টিক্কা খান গণহত্যাকারী, তিনি সমাবর্তনের পথে যাননি। মুক্তিযোদ্ধারা তখন ছিল ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের ঘাতক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বত্র সক্রিয়। হানাদার বাহিনীর দুর্গ ঢাকাতেও তৎপর ছিল তারা। টিক্কা খান এবং তার বর্বর বাহিনীর বেসামাল অবস্থা। কিন্তু তাদের অপরাধকর্ম চলছিলই। ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর চ্যান্সেলরের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি বাংলা বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামানকে চাকরিচ্যুত করেন এবং ছয় মাসের জন্য কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন [এ নির্দেশের কপি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে] । অধ্যাপক মুনির চৌধুরি, জ্ঞানতাপস হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীসহ আরও অনেক শিক্ষক, যারা স্বাধীনতার পথে বাঙালিকে জাগিয়ে তোলায় অবদান রেখেছিলেন তারা টিক্কা খানের রোষে পড়েন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা অভিযানের একনিষ্ঠ সমর্থক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ করেন। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় থেকে 'দুস্কৃতকারীদের' উচ্ছেদ করা হয়েছে হানাদাররদের দোসর এই উপাচার্য বলতেন সেটা বলতেন গর্বের সঙ্গে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্য অবদান রাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করার জন্য একের পর এক অন্যায় পদক্ষেপ নিতে থাকেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্ররোচনায় এই উপাচার্য নামের কলঙ্ক সৈয়দ সাজ্জাজ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠকে কুখ্যাত রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা-ধর্ষণের সহযোগী গোলাম আযম-মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বাধীন জামায়াতের ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসঙ্ঘকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন কুখ্যাত আলবদর বাহিনী গড়ে তুলতে। এই আলবদররাই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুনির চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, রাশেদুল হাসানসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণাদাতা বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী।

চ্যান্সেলর টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নিষ্ঠুর অপরাধের সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন হাসান জামান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, মোহর আলী, এ কে এম আবদুর রহমান, আবদুল বারীসহ কয়েকজন শিক্ষক নামধারী ব্যক্তিকে।এদের অপরাধের ক্ষমা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ পালন করছে ২০২১ সালে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর বছরেই পরিচালিত হয়েছিল নারকীয় গণহত্যা। এর প্রধান হোতা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাকে 'চ্যান্সেলরের মর্যাদা' প্রদান করা হয়েছিল। এযে কী অপমান ও লজ্জার! চ্যান্সেলর হিসেবে নরঘাতক টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী অপরাধমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং দুষ্কর্মে যাদের সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন সেসব দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করবে এবং তা দেশবাসী শুধু নয়, বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করবে, এ প্রত্যাশা থাকবে।

#

অজয় দাশগুপ্ত : বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

৩০.১১.২০২১ পিআইডি ফিচার